IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

পুরুষার্থঃ বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে নৈতিক প্রাসঙ্গিকতা

Sanjoy Singh
Assistant Professor
Department of Philosophy
Yogoda Satsanga Palpara Mahavidyalaya

সারসংক্ষেপ: ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে সংগতি বজায় রেখে ভারতীয় নীতিশাস্ত্র আলোচিত হয়েছে। ব্যক্তিগত ও সমাজিক জীবনচর্চা অনুশীলনের জন্য সনাতনী ভারতবর্ষে নীতিশাস্ত্রকারগণ নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের বাহকরূপে পুরুষার্থ নামক ধারণার প্রচলন করেন। এই 'পুরুষার্থ' শব্দের অর্থ হল পুরুষ যা কামনা করে বা যা জীবনে লাভ করতে চায় তাই হল পুরুষার্থ। আদিতে ধর্ম, অর্থ ও কাম -এই ত্রিবর্গকে পুরুষার্থরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে চতুর্বর্গ পুরুষার্থের উল্লেখ পাওয়া যায় - ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। পুরুষার্থ মানুষের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্টভাবে অবগত করে। মানব জাতিকে রক্ষা করতে এবং ষড়রিপুকে নিয়ন্ত্রণ করতে পুরুষার্থ যথেষ্টভাবে সহায়তা করে থাকে। নৈতিক ও সুখী জীবন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পুরুষার্থের ভূমিকা অপরিসীম। প্রত্যেকটি পুরুষার্থই একে অন্যের সহিত পরস্পর নিবিড় সম্পর্কযুক্ত। এদের একটি ছাড়া অন্যটিকে গ্রহণ করলে নৈতিক সমস্যা বা নৈতিক সংকটের প্রভাব সমাজে পড়বে। বর্তমান সময়ে যখন নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটেছে, তখন পুরুষর্থের গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অধ্যায়ে আমি দেখানোর চেষ্টা করব বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে পুরুষার্থের নৈতিক প্রাসঙ্গিকতা।

বীজশব্দ: পুরুষার্থ, ষড়রিপু, অপবর্গ, শ্রেয়-প্রেয়, বিশ্বশান্তি, আত্মিক উন্নতি, নৈতিক সংকট, মূল্যবোধ।

ভূমিকা: ভারতীয় নীতিবিদ্যা সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় ভারতীয় নীতিবিদ্যা মূলত আধ্যাত্মিক, আদর্শনিষ্ঠ ও জীবননিষ্ঠ। ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে সংগতি বজায় রেখে ভারতীয় নীতিশাস্ত্র আলোচিত হয়েছে। ব্যক্তিগত ও সমাজিক জীবনচর্চা অনুশীলনের জন্য সনাতনী ভারতবর্ষে নীতিশাস্ত্রকারগণ নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের বাহকরূপে পুরুষার্থ নামক ধারণার প্রচলন করেন। পুরুষার্থ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে – "যেন প্রযুক্তঃ পুরুষঃ প্রবর্ত্ততে, স পুরুষার্থঃ" অর্থাৎ পুরুষার্থ (পুরুষ +অর্থ =পুরুষার্থ) বলতে বোঝায় পুরুষ যা কামনা করে বা জীবনে যা লাভ করতে চায় তাই হল পুরুষার্থ।[১] পুরুষের যা লক্ষ্য বা অভিষ্ট তাই পুরুষার্থ। মহর্ষি জৈমিনি তার মীমাংসাসূত্র গ্রন্থে (৪/১/২) বলেছেন: "যস্মিন প্রীতিঃ পুরুষস্য তস্য লিপ্সার্থলক্ষণ অবিভক্তত্বাৎ" অর্থাৎ যে বিষয়ে মানুষের প্রীতি হয়, তাহাই পুরুষার্থ। তাহার যে লিপ্সা বা অনুষ্ঠান তাহা অর্থত অর্থাৎ স্বাভাবিক অনুরাগবশত প্রাপ্ত।[২] পুরুষার্থের সংখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ রয়েছে। আদিতে ধর্ম, অর্থ ও কাম - এই ত্রিবর্গকে পুরুষার্থরূপে উল্লেখ করা হয়েছে।"প্রকৃতপক্ষে সমাজে বসবাসকারী যেকোনো ব্যক্তির জন্য ত্রিবর্গ তত্ত্ব একটি সম্পূর্ণ জীবন পরিকল্পনাকে রোপণ করে। সমাজে বসবাসকারী যেকোনো বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের উচিত তিনটি পুরুষার্থকে যৌথভাবে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য করা, বিকল্পভাবে নয়"।[৩] কিন্তু

পরবর্তী কালে চতুর্বর্গ পুরুষার্থের উল্লেখ পাওয়া যায় - ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। ভারতীয় দর্শনে পুরুষার্থ এক গুরুত্বপূর্ণ ধারণা, যা মানুষের জীবনের এই চারটি মৌলিক লক্ষ্যকে নির্দেশ করে। পুরুষার্থ মানুষের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্টভাবে অবগত করে। মানব জাতিকে রক্ষা করতে এবং ষড়রিপুকে (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাত্সর্য) নিয়ন্ত্রণ করতে পুরুষার্থ যথেষ্টভাবে সহায়তা করে থাকে। নৈতিক ও সুখী জীবন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পুরুষার্থের ভূমিকা অপরিসীম। এমন অনেক ধর্মগ্রন্থ রয়েছে যেখানে নির্দিষ্ট কোন একটি পুরুষার্থ সম্পর্কে বিস্তরভাবে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন - কামসূত্র, ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র ইত্যাদি। প্রত্যেকটি পুরুষার্থই একে অন্যের সহিত পরস্পর নিবিড় সম্পর্কযুক্ত। এদের একটি ছাড়া অন্যটিকে গ্রহণ করলে নৈতিক সমস্যা বা নৈতিক সংকটের প্রভাব সমাজে পড়বে। "উল্লেখযোগ্য বেশিরভাগ ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় নৈতিকতার বাস্তবতাকে সমর্থন করেন। কারণ, তা মূল্যাবধারণার ক্ষেত্র হিসাবে মন স্বতন্ত্রভাবে বাস্তব। যা বহুবিধ কারণে চরিতার্থ করতে আমরা বাধিত"।[৪]

'ধর্ম' হল প্রথম পুরুষার্থ। ধর্ম হল তাই যা সমগ্র মানব সমাজকে ধারণ করে রাখে। "ধারণাৎ ধর্মম্ ইত্যাহুঃ"।[৫] ধর্মকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারলে ফলস্বরূপ মানব ঐক্যতান ও বিশ্বশান্তি গড়ে তোলা সম্ভব । দ্বিতীয় পুরুষার্থ 'অর্থ' প্রসঙ্গে বলা যায় - অর্থ হল সমগ্র মানব সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতির মূল চালিকাশক্তি। "অর্থ এব হি প্রধান ইতি কৌটিল্যঃ"।[৬] তবে ন্যায় ও সৎ পথে অর্জিত অর্থ এবং বহুজনের হিত সাধনকারী অর্থই পুরুষার্থরূপে বিবেচ্য। যে অর্থ ধর্ম বিরুদ্ধ তা পরিত্যাজ্য। "কাম" হল তৃতীয় পুরুষার্থ। ভারতীয় নীতিশাস্ত্র যে বাস্তবমুখী তা কামকে পুরুষার্থরূপে স্বীকার করার মধ্য দিয়ে বোঝা যায়। গার্হস্থ্য জীবনে নারী-পুরুষ সামাজিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সন্তান উৎপাদন করে বংশরক্ষা করেন। কামকে ধর্মের অবিরোধ হতে হবে। অর্থ ও কাম ধর্মের অনুসারী হলে জীবনের পরম উদ্দেশ্য মোক্ষ লাভ সম্ভব হবে। "সাধারণ লোকাচার এবং নীতিশাস্ত্রের মধ্যে ধর্মের প্রাধান্য সূচিত হয়ে বলা হয়েছে - সুখস্য মূলং ধর্মঃ - যদিও ধর্ম, অর্থ ও কামের সম-সাধনাই একজন আদর্শ রাজার পক্ষে সবচেয়ে অনুকূল - ধর্মার্থকামাঃ সমমেব সেব্যাঃ / যো হোকশক্ত: জনো জঘন্যঃ। অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম - এই তিনটি পুরুষার্থকে সমানভাবে সেবা করার কথাই বর্ণিত হয়েছে"।[৭] "মোক্ষ" হল চতুর্থ পুরুষার্থ। মোক্ষ হল মানব জীবনের পরম পুরুষার্থ। সাধারণত মোক্ষ বলতে বোঝায় দেহবন্ধন থেকে আত্মার মুক্তি ও দুঃখের আত্যন্তিক নিঃবৃত্তি এবং আত্মোপলব্ধি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি। মোক্ষবাদীরা ত্রিবর্গ পুরুষার্থের পরিবর্তে চতুর্বর্গ পুরুষার্থের উল্লেখ করে মোক্ষকে পরম পুরুষার্থ হিসাবে স্বীকার করেছেন। মোক্ষকে বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। যেমন -নির্বাণ, নি:শ্রেয়শ বা অপবর্গ, কৈবল্য ইত্যাদি। পুরুষার্থের চারটি স্তম্ভ ব্যক্তি জীবন পরিচালনার জন্য একটি ভারসাম্যপূর্ণ কাঠামো প্রদান করে। বর্তমান সময়ে যখন নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটেছে, তখন পুরুষর্থের গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অধ্যায়ে আমি দেখানোর চেষ্টা করব বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে পুরুষার্থের নৈতিক প্রাসঙ্গিকতা ।

ধর্ম : ভারতীয় শাস্ত্র পরম্পরায় প্রথম পুরুষার্থ হল "ধর্ম"। তবে , 'ধর্ম' শব্দটির নানাবিধ অর্থ রয়েছে। ধর্ম শব্দের একটি অন্যতম অর্থ হল " ধারনাৎ ধর্মম ইত্যাহুঃ" অর্থাৎ ধর্ম হল তাই যা মানব সমাজকে ধরে রাখে।[৮] 'ধৃ' ধাতুর সহিত 'মন' প্রত্যয় যোগে ধর্ম শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। 'ধৃ' ধাতুর অর্থ হল ধারণ করা। কাজেই ধর্ম শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল যা সমস্ত কিছুকে ধরে রাখে এবং নিজের অবস্থা থেকে বিচ্যুত হতে দেয় না। যেমন অগ্নির ধর্ম দহন করা , বায়ুর ধর্ম শুকিয়ে দেওয়া, বরফের ধর্ম শীতলতা ইত্যাদি । ধর্ম মানুষের মনে নীতিবোধ জাগ্রত করে। মানব সমাজে সুস্থ,স্বাভাবিক ও সুন্দভাবে বেঁচে থাকার জন্য কিছু নিয়ম নীতির প্রয়োজনীয়তা থাকা দরকার। মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে-

"বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এত চ্চতুনর্বিধমং প্রাহুঃ সাক্ষাৎ ধর্মস্য লক্ষণম্"।।[৯]

অর্থাৎ ধর্মের চারটি বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ রয়েছে - বেদ, স্মৃতি, শিষ্ট ব্যক্তির আচরণ এবং নিজের সুখ। মীমাংসকদের মতে বেদবিহিত কর্ম হল ধর্ম এবং বেদ বিরুদ্ধ কর্মই হল অধর্ম। ভারতীয় নীতিশাস্ত্র অনুসারে ধর্ম পালনের জন্য, ব্যক্তি মানুষের চিত্ত শুদ্ধি বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। ধর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে বলা হয়েছে : " অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দান, দম, দয়া, ক্ষান্তি" - এই নয়টি ধর্মের সাধনার কথা।[১০] ভারতীয় সনাতন ভাবধারায় কর্মকেই মানুষের আসল ধর্ম হিসাবে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। 'ধর্ম' শব্দটি ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে মানুষের কর্তব্যকেও নির্দেশ করে। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছিলেন

"তস্মাচ্ছ্রুস্ত্রং প্রমাণং তে কর্য্যাকার্যব্যবস্থিতৌ
জ্ঞাতা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্ত্তুমিহার্হসি"।।

অর্থাৎ 'কর্তব্য বা অকর্তব্য নির্ণয়ের জন্য তোমার কাছে শাস্ত্রই প্রমাণ, তোমাকে এই সংসারে শাস্ত্র অনুসারে কর্ম করতে হবে'।[১১] ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্ব এবং সামাজিক অগ্রগতির জন্য মানুষের কর্তব্য ধর্মপালন। কারণ ধর্ম সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে – "ধর্ম এব হতো হন্তি ধর্মো রক্ষতি রক্ষতি:" অর্থাৎ 'ধর্ম বিনষ্ট হলে বিনাশকারীকে বিনাশ করে এবং ধর্ম রক্ষিত হলে রক্ষা করে'।[১২] সমাজে সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য বিভিন্ন নৈতিক বিধি নিষেধ মেনে চলতে হয়।

ধর্ম শব্দটি একটি পরাতাত্ত্বিক অর্থকেও বহন করে যেখানে ধর্মকে বিশ্বজনীন নীতি (Universal Law) হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। এটাই 'ঋত' নামে পরিচিত। 'ঋত' হল এমন একটি অমোঘ নিয়ম যার দ্বারা সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। ঋগ্বেদে (১০/১৯০/১) বলা হয়েছে ঋত থেকে বরুণ ও মিত্র শক্তি লাভ করেন। বৈদিক যুগে ঋত শব্দের ধারণা হল নিয়মের স্থায়ী ভিত্তি।

ধর্ম শব্দটির বহুবিধ অর্থ থাকা সত্ত্বেও পুরুষার্থের পরিপেক্ষিতে ধর্ম শব্দটির অর্থ হল "ব্যবহার " যা সমাজে বসবাসকারী মানুষের কর্তব্যকে নির্দেশ করে।ভারতীয় নীতিশাস্ত্র যে বাস্তববিমুখ নয়, তা এখান থেকেই বোঝা যায় । সমাজে প্রত্যেক মানুষ তার নিজস্ব বর্ণ (গুণ) ও আশ্রম অনুসারে ধর্ম বা কর্তব্য পালন করবে। ধর্মের একটি নৈতিক ভিত্তি রয়েছে যা মানুষের আচার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। কারণ ব্যক্তি মানুষের নৈতিক চরিত্র উন্নতির মাধ্যমেই সমগ্র সমাজের কল্যাণ সম্ভব। মানুষের সমস্ত আচরণের নৈতিক ভিত্তি হল ধর্ম। "হবস সমর্থন করেন যে মানুষ স্বার্থপর, ঝগড়াটে এবং আক্রমণাত্মক। মানুষ সম্পূর্ণভাবে অহংপ্রকৃতির। মানুষের এমন স্বার্থপর স্বভাব অবধারিতরূপে মানুষদের মধ্যে দ্বন্দ্বকে ক্রমাগত প্রণোদিত করে। এটাই হচ্ছে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার স্বাভাবিক পরিস্থিতি"।[১৩] এমতাবস্তায় ধর্মকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারলে ফলস্বরূপ মানব ঐক্যতান ও বিশ্বশান্তি গড়ে তোলা সম্ভব। একজন যথার্থ নৈতিক ও ধার্মিক ব্যক্তির লক্ষণ প্রসঙ্গে মনু মনুসংহিতায় বলেছেন -

"ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্"।।

অর্থাৎ 'ধৃতি (ধারণ বা ধৈর্য), ক্ষমা (অপরাধ মার্জনা), দম (সহনশীলতা), অস্তেয় (অন্যায় পূর্বক পরধন চুরি না করা), শৌচ (দেহ ও মনের শুদ্ধতা), ইন্দ্রিয়নিগ্রহ (ইন্দ্রিয় সকলকে নিজ নিজ বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ রাখা), ধী (শাস্ত্র জ্ঞান), বিদ্যা (আত্ম জ্ঞান), সত্য ও অক্রোধ - এই দশটি ধর্মের লক্ষণ'।[১৪] এগুলি দৈনন্দিন জীবনে প্রতিনিয়ত চর্চা ও যর্চা করলে মানুষ যথার্থ নৈতিক ও ধার্মিক হওয়ার পথে অগ্রসর হয়। তবে, ধর্ম স্বত:মূল্যবান নয়, পরত:মূল্যবান। ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্য দিয়ে অর্থ ও কাম এই দুই

পুরুষার্থ লাভের কথা বলা হয়েছে। অর্থ কল্যাণকর হবে যদি তা ধর্মের অনুশাসনের বিরোধী না হয়। অনুরূপভাবে কামও কল্যাণকর হবে যদি তা ধর্মের অনুশাসনরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আসল কথা হল আমরা ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে লক্ষ্য করি যে অর্থ ও কাম এই দুই পুরুষার্থ ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। এমন নয় যে ধর্ম মানুষের কেবল বাহ্যিক আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে, ধর্ম ব্যক্তির আত্মিক বিকাশ সাধনের মাধ্যমে সমাজকে বিবাদ ও বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্ত রাখে। তানাহলে 'ধর্মের অভাবে জগতে শৃঙ্খলার অভাব ঘটত' (ধর্ম বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা)।[১৫] তাই মানুষ ধর্মকে জীবনের নৈতিক মানদন্ড হিসাবে স্বীকার করে জীবন ধারণ করে।

অর্থ : অর্থ হল দ্বিতীয় পুরুষার্থ। পুরুষার্থ প্রসঙ্গে 'অর্থ' শব্দটির মানে হল বিষয়- সম্পতি, টাকা-পয়সা ইত্যাদি যার দ্বারা মানুষ সমাজে সুখে স্বাচ্ছন্দে বসবাস করে। দ্বিতীয় পুরুষার্থ 'অর্থ' প্রসঙ্গে বলা যায় - অর্থ হল সমগ্র মানব সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতির মূল চালিকাশক্তি। "অর্থ এব হি প্রধান ইতি কৌটিল্যঃ"।[১৬] অনেক সমালোচক রয়েছেন যারা ভারতীয় নীতিশাস্ত্রকে বাস্তব-বিমুখ ও কাল্পনিক বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু অর্থকে পুরুষার্থ রূপে স্বীকার করার মাধ্যমে বোঝা যায় যে ভারতীয় নীতিশাস্ত্র কতটা বাস্তবমুখী। সুতরাং ভারতীয় নীতিশাস্ত্র মানেই যে শুধু অতিজাগতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তা বলা যথাযথ ঠিক নয়। পারিবারিক ,সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন অতিবাহিত করার জন্য যে অর্থের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তা ভারতীয় নীতিবিদ্যা অস্বীকার করে না। তবে, অর্থ উপেয় নয় তা কেবল উপায়। অর্থাৎ অর্থ স্বতঃমূল্যবান নয়, তা পরতঃমূল্যবান। কারণ, অর্থকে অর্থের জন্য কামনা করা হয় না। পারিবারিক ,সাংসারিক ও সামাজিক জীবন সুখের জন্য এবং ধর্মানুষ্ঠানের জন্য অর্থের কামনা করা হয়।

যেকোন উপায়ে অর্থের উপার্জন পুরুষার্থ রূপে বিবেচ্য হতে পারে না। যে অর্থ ধর্মানুকূল তাই পুরুষার্থ রূপে বিবেচ্য। অর্থাৎ, ন্যায় ও সৎপথে অর্জিত অর্থ এবং বহুজনের হিতসাধনকারী অর্থই হল পুরুষার্থ। আর যে অর্থ ধর্ম বিরুদ্ধ তা পরিত্যাজ্য। অর্থাৎ যে অর্থ অন্যায়ভাবে চৌর্যবৃত্তির দ্বারা অসৎ উপায়ে অন্যকে শোষণের মাধ্যমে অর্জিত এবং যে অর্থ অসৎ কাজে ব্যবহৃত হয় তা পুরুষার্থ রূপে বিবেচিত নয়। কাজেই মানুষের এমনভাবে অর্থ উপার্জন করা উচিত যার দ্বারা মানব সমাজের কল্যাণ হয়। অর্থাৎ যে অর্থ ইষ্ট সাধন করে এবং অনিষ্টকে বিনষ্ট করে তাই পুরুষার্থ। শুধু জল ও মৃত্তিকার দ্বারা শুচি হওয়া যায় না। যে ব্যক্তি অর্থাজনে শুচি অর্থাৎ বলপূর্বক অন্যায়ভাবে পরধন গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন সেই ব্যক্তিই যথার্থ শুচি। মনু মনুসংহিতায় বলেছেন -

সর্বেষামেব শৌচানামর্থশৌচং পরং স্মৃতম্।
যোহর্থে শুচির্হি স শুচরর্ন মৃদ্ধারিশুচিঃ শুচিঃ ।।[১৭]

সৎভাবে অর্জিত অর্থ ধর্মানুষ্ঠানে এবং যাগযজ্ঞাদিতে দান করা হয়। অসৎ উপায়ে অর্জিত অর্থ ধর্মানুষ্ঠানে ব্যবহৃত হলে বা দান করলে তা ফলদান করে না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ সঞ্চয় করে রাখাও নৈতিক অপরাধ। কারণ এর দ্বারা অন্যকে পরোক্ষভাবে শোষণ ও বঞ্চনা করা হয়। নিজ স্বার্থে এবং পরার্থে অর্থ ব্যয় করা প্রয়োজন। অর্থের সার্থকথা অর্থের সৎ ব্যবহারে। তা না হলে অর্থও অনর্থের কারণ হবে। অর্থ পরম পুরুষার্থ মোক্ষ লাভের সহায়ক হবে যদি তা ধর্মানুসারী হয়। সকল সুখের মূলে রয়েছে ধর্ম এবং ধর্মের মূলে রয়েছে অর্থ। অর্থাৎ ধর্ম এবং কাম অর্থের উপর নির্ভরশীল।

সুখস্যমূলম্ ধর্মঃ।
ধর্মস্যমূলম্ অর্থঃ।।[১৮]

কাম : ভারতীয় নীতিবিদ্যায় 'কাম' হল তৃতীয় পুরুষার্থ। সাধারণ অর্থে 'কাম' বলতে বোঝায় কামনা, প্রেম, ভালোবাসা ইত্যাদি। কিন্তু সংকীর্ণ অর্থে 'কাম' বলতে বোঝায় যৌনসুখ বা দৈহিক সুখ। খুব অল্প সংখ্যক মানুষ যারা নিবৃত্তি মার্গে বিচরণ করেন, তাদের মতে জীবনের চরম বা পরম উদ্দেশ্য হল আত্মোপলব্ধি বা মোক্ষ লাভ। কিন্তু বেশির ভাগ সাধারণ মানুষ প্রবৃত্তি মার্গে বিচরণ করেন, তাই তারা জীবনের পরম উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত নন। সেজন্য তাদের মধ্যে অর্থ এবং কামের প্রতি তীব্র আকাঙ্খা স্বাভাবিক। কামের চরম পরিতৃপ্তি ঘটানো সম্ভব নয়, বিষয় ভোগের দ্বারা ইন্দ্রিয়সকলকে যতই পিরিতৃপ্ত করা হয়, বিষয় ভোগের বাসনা ততোই বাড়তে থাকে। যে কাম অসংযত, অনিয়ন্ত্রিত তা প্রকৃতপক্ষে লালসা। আর লালসা মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে এবং সমাজ জীবনে বিবাদ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। পশুসুলভ কাম মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনে অন্তরায়। মনুষ্যতর প্রাণীর মধ্যে পশুসুলভ কাম-প্রবৃত্তি রয়েছে বলে তারা জীবনে বাধাহীন শুধু ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে চায়। কিন্ত মানুষ বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন জীব যা তার সহজাত প্রবণতা। তাই মানুষ শুধু ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করেই জীবনযাপন করে না, আধ্যাত্মিক সুখকেও জীবনে উপলব্ধি করতে চায়।

অনিয়ন্ত্রিত অর্থ ও সুখের কামনা মোক্ষ লাভের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে এবং মানুষের আত্মিক বিকাশের ক্ষেত্রেও বাধা সৃষ্টি করে। তাই ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে অর্থের নিয়ন্ত্রণকারী হিসাবে যেমন ধর্মের কথা বলা হয়েছে তেমনি কামের নিয়ন্ত্রণকারী হিসাবেও ধর্মের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ ধর্মের পথ অবলম্বন করেই মানুষের কাম চরিতার্থ করা উচিত। কামের উদ্দেশ্য হল মানুষের জীবনপ্রবাহকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং তাকে সংরক্ষণ করা। ধর্ম, অর্থ এবং কাম - এই ত্রিবর্গ পুরুষার্থের মধ্যে একটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। এই তিনটি পুরুষার্থকে সমানভাবে সেবা করার প্রসেঙ্গ ধর্মশাস্ত্রেও উল্লেখ করা রয়েছে। "ধর্মার্থকামাঃ সমমেব সেব্যাঃ"।[১৯] অর্থ এবং কাম মোক্ষের সহায়ক হবে যদি তা ধর্মের অনুশাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। তবে কাম স্বত:মূল্যবান নয়, পরত:মূল্যবান। কারণ, তা মোক্ষ লাভের উপায়রূপে মূল্যবান।

ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের মধ্যে চার্বাকগণই কামকে পরম পুরুষার্থ রূপে গণ্য করেছেন এবং গৌণ পুরুষার্থ রূপে অর্থকে স্বীকার করেছেন। তাদের মতে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। তাই তারা ধর্ম, ঈশ্বর, আত্মা, পরজন্ম - এইসব স্বীকার করেন না। তাদের মতে এসব পাষণ্ড নিশাচর পুরোহিতরাই সৃষ্টি করেছে নিজস্ব জীবিকা নির্বাহের জন্য। চার্বাক মতে ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ - এই চতুর্ভুতের স্বভাব সংমিশ্রণের ফলে জীবদেহের সৃষ্টি। দেহ বিনষ্ট হলে তা আর পুনরায় ফিরে আসবে না। তাই তারা বলেন –

"যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মিভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ"।।[২০]

তবে "এক শ্রেণীর চার্বাকগণের মতে, সুখভোগের আকাঙ্ক্ষাকে সুসংযত করিতে না পারিলে সুখভোগই অসম্ভব হয়। পশুসুলভ অনিয়ন্ত্রিত সুখ সুখপদবাচ্যই নহে। ইন্দ্রিয়গণকে নিয়ন্ত্রিত, মার্জিত ও সুশিক্ষিত না করিলে তাহারা বন্য জন্তুর ইন্দ্রিয় সংগ্রামের ন্যায় উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিবে। এইরূপ সুখ কখনও সুসভ্য এবং সুশিক্ষিত মনুষ্যের আদর্শ হইতে পারে না"।[২১] ভারতীয় নীতিশাস্ত্র যে বাস্তবমুখী তা কাম'কে পুরুষার্থ রূপে স্বীকার করার মধ্য দিয়ে বোঝা যায়। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ক্ষুধা, তৃষ্ণা,প্রেম, ভালোবাসা,যৌনপ্রবৃত্তি ইত্যাদি সহজাত ভাবেই বিদ্যমান। এই সকল সহজাত প্রবৃত্তি ধর্মের পথ অনুসরণের মাধ্যমে নিবারণের কথা বলা হয়েছে। ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে মানুষের জীবনকে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য,বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস -এই চারটি আশ্রমে বিভক্ত করা হয়েছে। গার্হস্থ্য জীবনে নারী পুরুষ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সন্তান উৎপাদন করে বংশরক্ষা করেন। মনুর মতে কামই হল কর্মের প্রেরণা। কর্ম কামনা রোহিত নয়। বৈদক কর্মকান্ড, যাকযজ্ঞাদি কাম্য ফল লাভের আশায় সম্পন্ন

হয়। স্বর্গাদি লাভের ইচ্ছায় কাম্য কর্ম সম্পন্ন করলে পুনর্জন্ম হয় আর স্বর্গাদিফলের কামনা ত্যাগ করে আত্মজ্ঞান সহকারে শাস্ত্রসম্মত কর্ম করলে মোক্ষ লাভ হয়। মনু বলেছেন-

"কামাত্মতা ন প্রশস্তা ন চৈবে হাস্ত্য কামতা।
কাম্য হি বেদাধিগমঃ কর্ম যোগসাচ্ছ বৈদকঃ"।।[২২]

মোক্ষ : ভারতীয় নীতিবিদ্যায় চতুর্থ পরম পুরুষার্থ হল মোক্ষ। মোক্ষ বলতে বোঝায় আত্যন্তিক দুখঃনিবৃত্তি এবং পরমানন্দ প্রাপ্তি। চার্বাক ব্যাতীত সকল ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় মোক্ষকে পরম পুরুষার্থ রূপে স্বীকার করেছেন। তবে বিভিন্ন দর্শন সম্প্রদায় মোক্ষকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন – নির্বাণ, অপবর্গ বা নি:শ্রেয়শ, কৈবল্য, মুক্তি ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়েছে। মোক্ষকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করলেও মোক্ষ বলতে সাধারণত যা বোঝায় তা হল - দেহবন্ধন থেকে আত্মার মুক্তি, জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকে জীবের মুক্তি এবং আত্মোপলব্ধি। মহর্ষি গৌতম ন্যায়সূত্র গ্রন্থে বলেছেন – "তদত্যন্তবিমোক্ষোহপবর্গ:", অর্থাৎ 'জীবের সমস্ত প্রকার আত্যন্তিক দুখঃনিবৃত্তি হল মোক্ষ বা অপবর্গ'।[২৩]

ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে ভোগবাদের পরিবর্তে ত্যাগবাদকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কিন্ত তার মানে এই নয় যে ভোগবাদকে অস্বীকার করা হয়েছে। সাধারণ মানুষ যারা প্রবৃত্তি মার্গে বিচরণ করেন তাদের নিকট ত্রিবর্গ পুরুষার্থ (ধর্ম, অর্থ ও কাম) বেশি গ্রহণযোগ্য। তারা ধর্মের অনুশাসনের মধ্য দিয়ে অর্থ ও কামকে জীবনে উপভোগ করতে চায়। ত্রিবর্গ পুরুষার্থের ক্ষেত্রে ধর্ম হল মুখ্য পুরুষার্থ এবং অর্থ ও কাম হল গৌণ পুরুষার্থ। ধর্ম স্বত:মূল্যবান, অর্থ ও কাম পরত :মূল্যবান। অর্থ ও কামের দ্বারা যা কিছু উৎপন্ন হয় তা অনিত্য বা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এ বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ রয়েছে। প্রাচীন মীমাংসকগণ বেদবিহিত যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানকে 'ধর্ম' বলেছেন। ধর্মাচারণের দ্বারা স্বর্গসুখ লাভ হয়। কিন্তু ধর্মের ফলও অনিত্য। স্বর্গাদি ফলভোগ বিনষ্ট হলে আবার ইহলোকে ফিরে আসতে হয়। অর্থ ও কামের মতো ধর্মের ফলও অনিত্য বা বিনষ্ট হয়। এ বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ রয়েছে – "তদ যথেহ কর্মচিতো লোক: ক্ষীয়োতে এবমেবামূত্র পুন্যচিতো লোক: ক্ষীয়োতে", অর্থাৎ ইহলোকে কর্মের দ্বারা অর্জিত ধনসম্পদ যেমন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ পরলোকে পুন্যকর্মের দ্বারা প্রাপ্ত স্বর্গাদি ফলও বিনষ্ট প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ত্রিবর্গ পুরুষার্থের ক্ষেত্রে ধর্ম, অর্থ ও কামের ফল অনিত্য।

মোক্ষের ধারণা বেদ- উপনিষদে গভীরভাবে আলোচিত হয়েছে। মানুষের নিকট শ্রেয়: এবং প্রেয়: দুটোই উপস্থিত থাকে। এদের স্বাধীনভাবে গ্রহণ করার অধিকারও রয়েছে। যারা অল্পবুদ্ধি তারা কেবল শরীর রক্ষার্থে প্রেয়:কে গ্রহণ করেন। কারণ তারা নিত্যানিত্য বস্তুবিচারে অসমর্থ। কিন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা শ্রেয়:কে গ্রহণ করেন। কারণ তারা ভালোভাবে জানেন প্রেয়: অপেক্ষা শ্রেয়: অনেক বেশি শ্রেষ্ঠ। কঠোপনিষদে বলা হয়েছে –"

"শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোহভি প্রেয়সো বৃণীতে প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে"।।[২৪]

তাই বলা যায় যারা নিবৃত্তি মার্গে বিচরণ করেন তাদের ক্ষেত্রে চতুর্বর্গ পুরুষার্থ (ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ) বেশি গ্রহনীয়। চতুর্বর্গ পুরুষার্থে মোক্ষ শ্রেষ্ঠ। মোক্ষবাদীরা ত্রিবর্গ পুরুষার্থের পরিবর্তে চতুর্বর্গ পুরুষার্থের উল্লেখ করে মোক্ষকে পরম পুরুষার্থ হিসাবে স্বীকার করেছেন। মোক্ষকে পরম পুরুষার্থ হিসাবে স্বীকার করার কারণ হল, মোক্ষ সুখস্বরূপ, মোক্ষ সর্বোত্তম সুখ যার অধিক সুখ কিছু হয় না। মোক্ষ লাভ করতে পারলে জীবের আর কামনা করার কিছু থাকে না, জীবের আর জানার কিছু থাকে না। মোক্ষ লাভ করতে পারলে জীবের জন্ম-মৃত্যু চক্রের অবসান ঘটে।

বর্তমান সময়ে পুরুষার্থের নৈতিক প্রাসঙ্গিকতা

১. ধর্ম ও আধুনিক সমাজঃ আজকের যুগে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা যাচ্ছে। রাজনীতি, ব্যবসা, শিক্ষা, এমনকি ব্যক্তিগত সম্পর্কেও অসততা ও স্বার্থপরতার প্রবণতা বাড়ছে। এই প্রেক্ষাপটে ধর্ম পুরুষার্থ সমাজে ন্যায় ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সাহায্য করতে পারে। ধর্মীয় মূল্যবোধ যেমন সত্যবাদিতা, দয়া, সহমর্মিতা, এবং কর্তব্যপরায়ণতা আধুনিক সমাজেও প্রাসঙ্গিক।

২. অর্থ ও আধুনিক জীবনের প্রয়োজনীয়তাঃ অর্থ উপার্জন ও ব্যবস্থাপনা আজকের জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। তবে অর্থনৈতিক উন্নতি যেন নৈতিকতার ক্ষতি না করে, সেটি নিশ্চিত করা জরুরি। অবৈধ উপায়ে সম্পদ অর্জন, দুর্নীতি ও প্রতারণা সমাজকে ধ্বংস করে। তাই অর্থ অর্জনের ক্ষেত্রে সততা ও ন্যায়পরায়ণতার গুরুত্ব অপরিসীম।

৩. কাম ও ব্যক্তিগত জীবনঃ আজকের ভোগবাদী সমাজে কাম পুরুষার্থের প্রকৃত অর্থ পরিবর্তিত হচ্ছে। ব্যক্তির ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা যতক্ষণ নৈতিকতার সীমার মধ্যে থাকে, ততক্ষণ তা সমাজের জন্য ক্ষতিকারক নয়। কিন্তু অসংযত ভোগলালসা, সম্পর্কের প্রতি অবহেলা ও নৈতিক অবক্ষয় ব্যক্তি ও সমাজের ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে। তাই কাম পুরুষার্থের মূল দর্শন অনুসরণ করে জীবনের প্রকৃত সুখ খুঁজে নেওয়া উচিত।

৪. মোক্ষ ও আত্মিক উন্নতিঃ বর্তমান সময়ে মানুষ মানসিক চাপ ও হতাশার শিকার হচ্ছে। ব্যস্ততা, প্রতিযোগিতা ও প্রযুক্তির প্রভাব মানুষকে মানসিকভাবে দূর্বল করে তুলছে। মোক্ষের ধারণা আমাদের শিখিয়ে দেয় কীভাবে আত্মিক উন্নতি ও মানসিক শান্তি অর্জন করা যায়। ধ্যান, যোগ, এবং সৎ চিন্তাধারা এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

উপসংহারঃ মানুষ মানুষ হিসাবে তখনই পদবাচ্য যখন সে তার নিজস্ব আত্মসম্মান বোধ সম্পর্কে সচেতন এবং সেই আত্মসম্মান বোধ সবার মধ্যে জাগিয়ে তোলার জন্য সহযোগিতা করতে পারেন। একজন মানুষকে সমাজ জীবনে যথার্থ নৈতিক চরিত্রবান মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য পুরুষার্থের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে পুরুষার্থ এমন একটি নৈতিক অবধারণা যা অনুসরণ করলে মানুষ ব্যক্তিগতভাবে এবং সামাজিকভাবে -- উভয়ের মধ্যে নৈতিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সক্ষম হয়। কিন্তু বর্তমানে বিশ্বায়নের যুগে আধুনিক যন্ত্র সভ্যতায় মানুষ এক চরম সংকটের মধ্যে রয়েছে। বিজ্ঞান প্রতিনিয়ত নিত্য নতুন নতুন আধুনিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করে মানব সভ্যতাকে এক ভয়ানক পরিস্থিতির অভিমুখে নিয়ে যাচ্ছে। তবে এমন বলা ন্যায়সঙ্গত হবে না যে মানব সভ্যতাকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের কোন ভূমিকা নেই। বিজ্ঞানের আবিষ্কার তখনই আশীর্বাদ রূপে গণ্য হবে যখন তা মানুষের এবং সমাজের কল্যাণ সাধন করবে। মানুষ কেবল পাশবিক প্রয়োজন পূরণ করতে গিয়ে বারংবার সংঘাতের মধ্য দিয়ে যাচ্ছ। এভাবে চলতে থাকলে আদর্শ উপযোগী মানব সমাজ গড়ে তোলা অসম্ভব হয়ে পড়বে। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির হিংসাত্মক কার্যকলাপ ক্রমাগত লক্ষ্য করা যায়। এই রাজনৈতিক প্রতিহিংসা আঞ্চলিক ক্ষেত্রে এমন কি পরিবারের মধ্যেও প্রবেশ করেছে।

এরূপ ভয়ানক পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করে সুন্দর উপযোগী মানব সমাজ গঠন ও পরিচালনা অসম্ভব হয়ে পড়বে। এমতাবস্থায় পুরুষার্থের যথার্থ প্রয়োগই মানব সমাজকে বেঁচে থাকার সঠিক পথ দেখাবে। মানুষ ষড়রিপু সম্পন্ন --কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাতসর্য। এই সকল প্রবৃত্তিকে যতবেশি অসংযতভাবে চরিতার্থ করার প্রবণতা বাড়বে, মানব এবং মানব সমাজে কিন্তু ততোবেশি নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটবে। পুরুষার্থ অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষ ষড়রিপু নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চতুর্বর্গ পুরুষার্থের যথাযথভাবে শাস্ত্রসম্মত অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষ নৈতিক চরিত্রসম্পন্ন

হয়। মানুষ নীতিসম্মত হলে নৈতিক মানুষের দ্বারা নৈতিক সমাজ গঠন করা সম্ভপ হবে। কাজেই সুন্দর মানুষ দিয়ে সুন্দর সমাজ গড়ার পশ্চাতে পুরুষার্থের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

মানব সভ্যতা নৈতিকভাবে উন্নতি এবং অগ্রগতির পশ্চাতে পুরুষার্থের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান সময়ে প্রত্যেকটি মানুষের মনে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুশ্চিন্তা অহরহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ধর্ম মানে শুধু আচার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা নয়, অর্থের অহংকার মানুষের অধগোতির কারণ। এখন কামের অর্থ হয়েছে কেবল যৌনতৃষ্ণাকে পরিতৃপ্ত করা এবং মোক্ষ তো উপহাসের বিষয়। জাতি -ধর্ম -বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ - এই চতুর্বর্গ পুরুষার্থের যথার্থ শাস্ত্রসম্মত ধারণা জীবনে উপলব্ধি করে প্রয়োগ করতে পারলে আধুনিক মানব সভ্যতায় মানব কল্যাণ যে অবধারিত - এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। সুতরাং দৃঢ়তার সহিত বলা যায় যে, পুরুষার্থ শুধুমাত্র প্রাচীন দর্শনের অংশ নয়, এটি আজকের যুগেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। সমাজ ও ব্যক্তির ভারসাম্যপূর্ণ বিকাশের জন্য ধর্ম, অর্থ, কাম, ও মোক্ষের মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখা প্রয়োজন। যদি আমরা এই চেতনা অনুসরণ করি, তবে সমাজ আরও নৈতিক, উন্নত ও শান্তিপূর্ণ হয়ে উঠবে। তাই পুরুষার্থের নীতি আমাদের বর্তমান জীবনে এক নতুন আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করতে পারে।

তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি

১. শাস্ত্রী, পঞ্চানন (অনুদিত), চার্বাক দর্শনম্ (শ্রীমৎ সায়ণমাধবকৃত সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে প্রথমৎ), সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার কলকাতা, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ, পৃঃ- ১৬।

২. ভট্টাচার্য, সুখময়, পূর্বমীমাংসা দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৮৩, পৃ: ৯

৩. Tiwari, Kedar Nath, Classical Indian Ethical Thought (A Philosophical Study of Hindu, Jaina and Bauddha Morals), Motilal Banarsidass Publishers, Delhi, Reprint 2017, P-210.

৪. Ranganathan, Shyam, Ethics and the History of Indian Philosophy, Motilal Banarsidass Publishers, Delhi, Revised Edition, 2017, P- 344.

৫. মহাভারত, কর্ণপর্ব, ৬৯/৫৮।

৬. চাণক্য সূত্র,-61।

৭. ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, মহাভারত (নীতি. অনীতি. দুর্নীতি.) দীপ প্রকাশন, কলকাতা, তৃতীয় দীপ সংস্করণ, ২০২৪, পৃ: ৪০২।

৮. মহাভারত, কর্ণপর্ব, ৬৯/৫৮।

৯. মনুসংহিতা -২/১২।

১০. Hiriyanna, M., Philosophy of Values, The Cultural Heritage of India, Vol. III, P. 647.

১১. ভগবদ্গীতা - ১৬/২৪।

১২. মনুসংহিতা -৮/১৫।

১৩. Sinha, Jadunath, A Manual of Ethics, New Central Book Agency, Kolkat, 1984, P- 258.

১৪. মনুমনুসংহিতা- ৬/৯২।

১৫. ভট্টাচার্য, গোপীনাথ, ভারতীয় দর্শন ও তার বিশিষ্ট পটভূমিকা, তত্ত্ব ও প্রয়োগ, ১৯৯৫, পৃ:-৫৪।

১৬. চাণক্য সূত্র- 61।

১৭. মনুসংহিতা- ৫/১০৬।

১৮. চাণক্য সূত্রঃ- ১/২।

১৯. ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ মহাভারত (নীতি. অনীতি. দুর্নীতি.), দীপ প্রকাশন, কলকাতা, তৃতীয় দীপ সংস্করণ, ২০২৪, পৃ: ৪০২।

২০. চক্রবর্তী, সত্যজ্যোতি (বঙ্গানুবাদ), সায়ণ মাধবীয়ঃ সর্ব্বদর্শন সংগ্রহঃ, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা, প্রথম খন্ড, ২০১৪, পৃঃ- ৩৬।
২১. শাস্ত্রী, দক্ষিণারঞ্জন চার্বাক দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০১৩, পৃ:১৩৯।
২২. মনুসংহিতাঃ- ২/২।
২৩. ন্যায়সূত্র- ১/১/২২।
২৪. কঠোপনিষদঃ- ১/২/।